

# ପଲ୍ଲୀ-ସମାଜ

ଶରତ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ

ପ୍ରକାଶ କାଳଃ ୧୯୧୯

**Published by**

[porua.org](http://porua.org)

# সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নবম পরিচ্ছেদ

দশম পরিচ্ছেদ

একাদশ পরিচ্ছেদ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

## পল্লী-সমাজ

১

বেণী ঘোষাল মুখুয্যেদের অন্দরের প্রাঙ্গণে পা দিয়াই সম্মুখে এক প্রৌঢ়া রমণীকে পাইয়া প্রশ্ন করিলেন, “এই যে মাসি, রমা কই গা?” মাসী আঁহিক করিতেছিলেন, ইঙ্গিতে রান্নাঘর দেখাইয়া দিলেন। বেণী উঠিয়া আসিয়া রন্ধনশালার চৌকাঠের বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিলেন, “তা হ’লে রমা, কি করবে স্থির করলে?” জ্বলন্ত উনান হইতে শব্দায়মান কড়াটা নামাইয়া রাখিয়া রমা মুখ তুলিয়া চাহিল,—“কিসের বড়দা?”

বেণী কহিলেন, “তারিণী খুড়োর শ্রাদ্ধের কথাটা বোন! রমেশ ত কা’ল এসে হাজির হয়েছে। বাপের শ্রাদ্ধ খুব ঘটা ক’বেই করবে ব’লে বোধ হচ্ছে;—যাবে নাকি?”

রমা দুই চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত করিয়া বলিল, “আমি যাব তারিণী ঘোষালের বাড়ী?” বেণী ঈষৎ লজ্জিত হইয়া কহিল—“সে ত জানি দিদি! আর যেই যাক্, তোরা কিছুতেই সেখানে যাবিনে। তবে শুনচি নাকি, ছোঁড়া সমস্ত বাড়ী-বাড়ী নিজে গিয়ে বলবে—বজ্জাতি বুদ্ধিতে সে তার বাপেরও ওপরে যায়—যদি আসে, তা হ’লে কি বলবে?” রমা সরোষে জবাব দিল, —“আমি কিছুই বোলবো না—বাইরের দরওয়ান তার উত্তর দেবে—” পূজানিরতা মাসীর কণরন্ধ্রে এই অত্যন্ত রুচিকর দলাদলির আলোচনা পৌঁছিবামাত্রই তিনি আঁহিক ফেলিয়া রাখিয়া উঠিয়া আসিলেন। বোনঝির কথা শেষ না হইতেই অত্যন্ত শৈথিল্যের মত ছিটকাইয়া উঠিয়া কহিলেন, “দরওয়ান কেন? আমি বলতে জানিনে? নচ্ছার ব্যাটাকে এমনি বলাই বলব যে, বাছাধন জন্মে কখন আর মুখুয্যেবাড়ীতে মাথা গলাবে না। তারিণী ঘোষালের ব্যাটা ঢুকবে নেমতন্ন করতে আমার বাড়ীতে? আমি কিছুই ভুলিনি বেণীমাধব! তারিণী তার এই ছেলের সঙ্গেই আমার রমার বিয়ে দিতে চেয়েছিল। তখনও ত আর আমার যতীন জন্মায় নি—ভেবেছিল, যদু মুখুয্যের সমস্ত বিষয়টা তা হ’লে মুঠোর মধ্যে আসবে—বুঝলে না বাবা বেণি! তা যখন হ’ল না, তখন ঐ ভৈরব আচার্য্যিকে দিয়ে কি সব জপতপ, তুক্তাক্ করিয়ে মায়ের কপালে আমার এমন আগুন ধরিয়ে দিলে যে, ছ’মাস পেরুল না, বাছার হাতের নোয়া, মাথার সিঁদুর ঘুচে গেল! ছোট জাত হ’য়ে চায় কিনা যদু মুখুয্যের মেয়েকে বৌ করতে! তেমনি হারামজাদার মরণও হয়েছে—ব্যাটার হাতের আগুনটুকু পর্যন্ত পেল না! ছোট-জাতের মুখে আগুন!” বলিয়া মাসী যেন কুস্তি শেষ করিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ ছোট জাতের উল্লেখে বেণীর মুখ স্নান হইয়া গিয়াছিল, কারণ তারিণী ঘোষাল তাহারই খুড়া। রমা ইহা লক্ষ্য করিয়া মাসীকে তিরস্কারের কণ্ঠে কহিল, “কেন মাসি, তুমি মানুষের জাত নিয়ে কথা কও? জাত ত আর কারুর হাতেগড়া জিনিস নয়? যে যেখানে জন্মেছে সেই তার ভাল।”

বেণী লজ্জিতভাবে একটুখানি হাসিয়া কহিল,—“না, রমা, মাসী ঠিক কথাই বলছেন। তুমি কত বড় কুলীনের মেয়ে, তোমাকে কি আমরা ঘরে আনতে পারি বোন! ছোট খুড়োর এ কথা মুখে আনাই বেয়াদপি। আর তুচ্ছতাকের কথা যদি বল, ত’ সে সত্যি। দুনিয়ায় ছোট খুড়ো আর ঐ ব্যাটা ভৈরব আচার্য্যের অসাধ্য কাজ কিছু নেই। ঐ ভৈরব ত হয়েছে আজকাল রমেশের মুরুবি।”

মাসী কহিলেন—“সে ত জানা কথা বেণি! ছোঁড়া দশ বারো বছর ত দেশে আসেনি—এতদিন ছিল কোথায়?” “কি ক’রে জানব মাসি? ছোট খুড়োর সঙ্গে তোমাদেরও যে ভাব, আমাদেরও তাই। শুনচি, এতদিন নাকি বোম্বাই, না, কোথায় ছিল। কেউ বলচে, ডাক্তারি পাশ ক’রে এসেচে, কেউ বলচে, উকিল হয়ে এসেচে—কেউ বলচে, সমস্তই ফাঁকি—ছোঁড়া নাকি পাঁড় মাতাল! যখন বাড়ী এসে পৌঁছল, তখন দুই চোখ নাকি জবাফুলের মত রাঙা ছিল।” “বটে? তা হ’লে তাকে ত বাড়ী ঢুকতে দেওয়াই উচিত নয়!” বেণী উৎসাহভরে মাথার একটা ঝাঁকানি দিয়া কহিল—“নয়ই ত! হাঁ রমা, তোমার রমেশকে মনে পড়ে?” নিজের হতভাগ্যের প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়ায় রমা মনে মনে লজ্জা পাইয়াছিল। সলজ্জ মৃদু হাসিয়া কহিল,—“পড়ে বৈ কি। সে ত আমার চেয়ে বেশী বড় নয়। তা ছাড়া শীতলাতলার পাঠশালে দুজনেই পড়তাম যে। কিন্তু তার মায়ের মরণের কথা আমার খুব মনে পড়ে। খুড়ীমা আমাকে বড় ভালবাসতেন।” মাসী আর একবার নাচিয়া উঠিয়া বলিলেন,—“তার ভালবাসার মুখে আগুন! সে ভালবাসা কেবল নিজের কাজ হাসিল করবার জন্যে। তাদের মতলবই ছিল, তোকে কোনমতে হাত-করা।”

বেণী অত্যন্ত বিজ্ঞের মত সায় দিয়া কহিল, “তাতে আর সন্দেহ কি মাসি! ছোট খুড়ীমাও যে,—“কিন্তু তাহার বক্তব্য শেষ না হইতেই রমা অপ্রসন্নভাবে মাসীকে বলিয়া উঠিল,—“সে সব পুরণো কথায় দরকার নেই মাসি?”

রমেশের পিতার সহিত রমার যত বিবাদই থাক, তাহার জননীর সম্বন্ধে রমার কোথায় একটু যেন প্রচ্ছন্ন বেদনা ছিল। এতদিনেও তাহা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই। বেণী তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া বলিলেন,—“তা বটে, তা বটে। ছোটখুড়ী ভালমানুষের মেয়ে ছিলেন। মা আজও তাঁর কথা উঠলে চোখের জল ফেলেন।”

কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়ে দেখিয়া বেণী তৎক্ষণাৎ এসকল প্রসঙ্গ চাপা দিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, “তবে এই ত স্থির রইল দিদি, নড়চড় হবে না ত?” রমা হাসিল। কহিল, “বড়দা, বাবা বলতেন, আগুনের শেষ, ঋণের শেষ, আর শত্রুর শেষ কখনো রাখিসনে মা। তারিণী ঘোষাল জ্যাণ্ডে আমাদের কম জ্বালা দেয়নি—বাবাকে পর্যন্ত জেলে দিতে চেয়েছিল। আমি কিছুই ভুলিনি বড়দা,—যতদিন বেঁচে থাকব, ভুলব না। রমেশ সেই শত্রুরই

ছেলে ত! তা ছাড়া আমার ত কিছুতেই যাবার জো নেই। বাবা আমাদের দুই ভাইবোনকে বিষয় ভাগ ক’রে দিয়ে গেছেন বটে, কিন্তু সমস্ত বিষয় রক্ষা করবার ভার শুধু আমারই উপর যে! আমার ত নয়-ই, আমাদের সংশ্রবে যারা আছে, তাদের পর্যন্ত যেতে দেব না।” একটু ভাবিয়া কহিল, “আচ্ছা বড়দা, এমন করতে পার না যে, কোনও ব্রাহ্মণ না তাদের বাড়ী যায়?” বেণী একটু সরিয়া আসিয়া গলা খাটো করিয়া বলিল, “সেই চেষ্টাই ত কর্চি বোন। তুই আমার সহায় থাকিস্, আর আমি কোনও চিন্তে করিনে। রমেশকে এই কুঁয়াপুর থেকে না তাড়াতে পারি ত আমার নাম বেণী ঘোষাল নয়। তার পরে রইলাম আমি, আর ঐ ভৈরব আচার্য্য! আর তারিণী ঘোষাল নেই; দেখি এ ব্যাটাকে এখন কে রক্ষা করে!” রমা কহিল, “রক্ষা করবে রমেশ ঘোষাল। দেখো বড়দা, এই আমি ব’লে রাখলুম, শত্রুতা করতে এও কম করবে না।” বেণী আরও একটু অগ্রসর হইয়া একবার এদিক্-ওদিক্ নিরীক্ষণ করিয়া লইয়া চৌকাঠের উপর উঁচু হইয়া বসিলেন। তারপরে কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মৃদু করিয়া বলিলেন, “রমা, বাঁশ নুইয়ে ফেলতে চাও ত, এই বেলা। পেকে গেলে আর হবে না, তা নিশ্চয় ব’লে দিচ্ছি। বিষয়-সম্পত্তি কি ক’রে রক্ষা করতে হয় শেখেনি—এর মধ্যে যদি না শত্রুকে নিশ্চল করতে পারা যায়, ত ভবিষ্যতে আর যাবে না; এই কথাটা আমাদের দিবারাত্রি মনে রাখতে হবে যে, এ তারিণী ঘোষালেরই ছেলে—আর কেউ নয়!” “সে আমি বুঝি বড়দা!” “তুই না বুঝিস্ কি দিদি! ভগবান্ তোকে ছেলে গড়তে গড়তে মেয়ে গড়ে ছিলেন বৈ ত নয়। বুদ্ধিতে একটা পাকা জমিদারও তোর কাছে হটে যায়, এ কথা আমরা সবাই বলাবলি করি। আচ্ছা, কা’ল একবার আসব। আজ বেলা হ’ল যাই—” বলিয়া বেণী উঠিয়া পড়িলেন। রমা এই প্রশংসায় অত্যন্ত প্রীত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিনয়-সহকারে কি একটু প্রতিবাদ করিতে গিয়াই তাহার বুকের ভিতর ছাঁৎ করিয়া উঠিল। প্রাঙ্গণের এক প্রান্ত হইতে অপরিচিত গভীর-কণ্ঠের আহ্বান আসিল—“রাণী, কই রে?” রমেশের মা এই নামে ছেলেবেলায় তাকে ডাকিতেন। সে নিজেই এতদিন তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল। বেণীর প্রতি চাহিয়া দেখিল, তাহার সমস্ত মুখ কালীবর্ণ হইয়া গিয়াছে। পরক্ষণেই রুম্মমাথা, খালি পা, উত্তরীয়টা মাথায় জড়ানো—রমেশ আসিয়া দাঁড়াইল। বেণীর প্রতি চোখ পড়িবামাত্র বলিয়া উঠিল, “এই যে বড়দা, এখানে? বেশ, চলুন, আপনি না হ’লে করবে কে? আমি সারা গাঁ আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি! কৈ রাণী কোথায়?” বলিয়াই কবাটের সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। পলাইবার উপায় নাই, রমা ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। রমেশ মুহূর্তমাত্র তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মহাবিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিল—“এই যে! আরে ইস্, কত বড় হয়েছিস রে? ভাল আছিস্?” রমা তেমনি অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। হঠাৎ কথা কহিতেই পারিল না। কিন্তু রমেশ একটুখানি হাসিয়া তৎক্ষণাৎ কহিল, “চিন্তে পাচ্ছিস্ ত রে? আমি তোদের রমেশ দা!”

এখনও রমা মুখ তুলিয়া चाहিতে পারিল না। কিন্তু, মৃদু-কণ্ঠে প্রশ্ন করিল,  
“আপনি ভাল আছেন?”

“হাঁ ভাই, ভাল আছি। কিন্তু, আমাকে ‘আপনি’ কেন রমা?” বেণীর দিকে চাহিয়া একটুখানি মলিন হাসি হাসিয়া বলিল, “রমার সেই কথাটা আমি কোন দিন ভুলতে পারিনি বড়দা! যখন মা মারা গেলেন, ও তখন ত খুব ছোট। সেই বয়সেই আমার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলেছিল, ‘রমেশদা, তুমি কেঁদে না, আমার মাকে আমরা দু’জনে ভাগ ক’রে নেব।’ তোর সে কথা বোধ করি মনে পড়ে না রমা, না? আচ্ছা, আমার মাকে মনে পড়ে ত?” কথাটা শুনিয়া রমার ঘাড় যেন লজ্জায় আরও ঝুঁকিয়া পড়িল। সে একটিবারও ঘাড় নাড়িয়া জানাইতে পারিল না যে, খুড়ীমাকে তাহার খুব মনে পড়ে। রমেশ বিশেষ করিয়া রমাকে উদ্দেশ্য করিয়াই বলিতে লাগিল —“আর ত সময় নেই, মাঝে শুধু তিনটি দিন বাকি, যা করবার ক’রে দাও ভাই, যাকে বলে একান্ত নিরাশ্রয়, আমি তাই হয়েই তোমাদের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছি। তোমরা না গেলে এতটুকু ব্যবস্থা পর্যন্তও করতে পারছি না।”

মাসী আসিয়া নিঃশব্দে রমেশের পিছনে দাঁড়াইলেন। বেণী অথবা রমা কেহই যখন একটা কথারও জবাব দিল না, তখন তিনি সুমুখের দিকে সরিয়া আসিয়া রমেশের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, “তুমি বাপু, তারিণী ঘোষালের ছেলে না?” রমেশ এই মাসীটিকে ইতিপূর্বে দেখেন নাই; কারণ, সে গ্রামত্যাগ করিয়া যাইবার পরে ইনি রমার জননীর অসুখের উপলক্ষ্যে সেই যে মুখুয্যে বাড়ী চুকিয়াছিলেন, আর বাহির হন নাই। রমেশ কিছু বিস্মিত হইয়াই তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। মাসী বলিলেন, “না হ’লে এমন বেহায়া পুরুষমানুষ আর কে হবে? যেমন বাপ তেমনি ব্যাটা। বলা নেই, কথা নেই, একটা গেরস্তর বাড়ীর ভেতর ঢুকে উৎপাত করতে সরম হয় না তোমার?” রমেশ বুদ্ধিভ্রষ্টের মত কাঁঠ হইয়া চাহিয়া রহিল। “আমি চললুম” বলিয়া বেণী ব্যস্ত হইয়া সরিয়া পড়িলেন। রমা ঘরের ভিতর হইতে বলিল, “কি বোক্‌চ মাসী, তুমি নিজের কাজে যাও না—” মাসী মনে করিলেন, তিনি বোনঝির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটা বুঝিলেন। তাই কণ্ঠস্বরে আরও একটু বিষমিশাইয়া কহিলেন, “নে, রমা, বকিসনে। যে কাজ করতেই হবে, তাতে আমার তোদের মত চক্ষুলাজ্জা হয় না। বেণীর অমন ভয়ে পালানর কি দরকার ছিল? ব’লে গেলেই ত হ’ত, আমরা বাপু তোমার গমস্তাও নই, খাস্‌ তালুকের প্রজাও নই যে, তোমার কস্মবাড়ীতে জল তুলতে, ময়দা মাখতে যাবো। তারিণী মরেচে, গাঁ শুদ্ধ লোকের হাড় জুড়িয়েচে; এ কথা আমাদের ওপর বরাত দিয়ে না গিয়ে নিজে ওর মুখের ওপর ব’লে গেলেই ত পুরুষ-মানুষের মত কাজ হ’ত।” রমেশ তখনও নিষ্পন্দ অসাড়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল। বস্তুতঃই এ-সকল কথা তাহার একান্ত দুঃস্বপ্নেরও অগোচর ছিল। ভিতর হইতে রান্নাঘরে কবাটের শিকলটা ঝন্‌ঝন্‌ করিয়া নড়িয়া

উঠিল। কিন্তু কেহই তাহাতে মনোযোগ করিল না। মাসী রমেশের নির্বাক ও অত্যন্ত পাংশুর্গ মুখের প্রতি চাহিয়া পুনরপি বলিলেন, “যাই হোক, বামুনের ছেলেকে আমি চাকর দরওয়ান দিয়ে অপমান করাতে চাইনে,—একটু হুঁস করে কাজ কর বাপু—যাও। কচি খোকাটি নও যে, ভদ্রলোকের বাড়ীর ভেতর ঢুকে আবদার ক’রে বেড়াবে! তোমার বাড়িতে আমার রমা কখন পা ধুতেও যেতে পারবে না, এই তোমাকে আমি ব’লে দিলুম।”

হঠাৎ রমেশ যেন নিদ্রোথিতের মত জাগিয়া উঠিল, এবং পরক্ষণেই তাহার বিস্তৃত বক্ষের ভিতর হইতে এমনি গভীর একটা নিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল যে, সে নিজেও সেই শব্দে সচকিত হইয়া উঠিল। ঘরের ভিতর কবাটের অন্তরালে দাঁড়াইয়া রমা মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল। রমেশ একবার বোধ করি ইতস্ততঃ করিল, তাহার পরে, রান্নাঘরের দিকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল, “যখন যাওয়া হতেই পারে না, তখন আর উপায় কি! কিন্তু আমি ত এত কথা জান্তাম না—না জেনে যে উপদ্রব ক’রে গেলাম, সেজন্য আমাকে মাপ কোরো রাণি!” বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। ঘরের ভিতর হইতে এতটুকু সাড়া আসিল না। যাহার কাছে ক্ষমা-ভিক্ষা করা হইল, সে যে অলক্ষ্যে নিঃশব্দে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, রমেশ তাহা জানিতেও পারিল না। বেণী তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। সে পলায় নাই, বাহিরে লুকাইয়া অপেক্ষা করিতেছিল মাত্র। মাসীর সহিত চোখাচোখি হইতেই তাহার সমস্ত মুখ আহ্লাদে ও হাসিতে ভরিয়া গেল, সরিয়া আসিয়া কহিল, “হাঁ, শোনাতে বটে মাসি! আমার সাধ্যিই ছিল না অমন ক’রে বলা! এ কি চাকর-দরওয়ানের কাজ রমা! আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখলাম কি না, ছোঁড়া মুখখানা যেন আমাঢ়ের মেঘের মত ক’রে বা’র হয়ে গেল! এই ত—ঠিক হ’ল!” মাসী ক্ষুণ্ণ অভিমানের সুরে বলিলেন, “খুব ত হ’ল জানি; কিন্তু এই দুটো মেয়েমানুষের ওপর ভার না দিয়ে, না স’রে গিয়ে নিজে ব’লে গেলেই ত আরও ভাল হ’ত! আর নাই যদি বলতে পারতে আমি কি বল্‌লুম তাকে, দাঁড়িয়ে থেকে শুনে গেলে না কেন বাছা? অমন স’রে পড়া উচিত কাজ হয়নি!” মাসীর কথার ঝাঁজে বেণীর মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। সে যে এই অভিযোগের কি সাফাই দিবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না, কিন্তু অধিকক্ষণ ভাবিতে হইল না, হঠাৎ রমা ভিতর হইতে তাহার জবাব দিয়া বসিল; এতক্ষণ সে একটি কথাও কহে নাই। কহিল, “তুমি যখন নিজে বলেছ মাসি, তখন সেই ত সকলের চেয়ে ভাল হয়েছে। যে যতই বলুক না কেন, এতখানি বিষ জিভ দিয়ে ছড়াতে তোমার মত কেউ ত পেরে উঠত না!” মাসী এবং বেণী উভয়েই যার-পর-নাই বিস্ময়াপন্ন হইয়া উঠিলেন। মাসী রান্নাঘরের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, “কি বল্‌লি লা?” “কিছু না। আহ্নিক করতে বসে ত সাতবার উঠলে—যাও না, ওটা সেরে ফেল না—রান্নাবান্না কি হবে না?” বলিতে বলিতে রমা নিজেও বাহির হইয়া আসিল এবং কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া বারান্দা পার হইয়া ও দিকের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। বেণী শুষ্কমুখে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, “ব্যাপার কি



মাসি?” “কি ক’রে জান্ৰ বাছা? ও রাজ-রাণীৰ মেজাজ বোঝা কি  
আমাদের দাসীবাঁদীৰ কৰ্ম্ম?” বলিয়া ক্ৰোধে, ক্ষোভে, তিনি মুখখানা  
কালীৰ্ণ করিয়া তাঁহাৰ পূজাৰ আসনে গিয়া উপবেশন করিলেন, এবং  
বোধ করি বা মনে মনে ভগবানের নাম করিতেই লাগিলেন। বেণী ধীৰে ধীৰে  
প্রস্থান করিল।